ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গ্রামীণ নারীর ভূমিকা: একটি সমীক্ষা

*নাসরিন সুলতানা

সার-সংক্ষেপ : রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশ গ্রহণের ইতিহাস অনেক পুরোনো। ইতিহাসে অনেক মহিয়সী নারী পুরুষের পাশাপাশি কিংবা কখনো পুরুষের উর্দ্ধে উঠে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এগুলো একেবারে বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এসবের ফলে গণতান্ত্রিকভাবে নারী সমাজের কোনো উন্নতি হয়নি কিংবা নারী সমাজ পুরুষের সমঅধিকার নিয়ে রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ পুরুষের স্বার্থ থেকে কেবল পৃথক নয় বর্বর। কাজেই নারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সমাজকেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। অন্যদের দ্বারা নারীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক বিতর্কে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি নারীকেই তুলে ধরতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ ঘটেছে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নিঃসন্দেহে ঐসব অংশ গ্রহণের ইতিহাস ছিল গৌরবোজ্জ্বল।

ভূমিকা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রমের একটি অনুক্রম, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে। এই প্রক্রিয়ার ভেতর রয়েছে শাসক-নির্বাচন এবং জননীতি প্রণয়নের বিভিন্ন দিক। আরো স্পষ্ট করে বললে এরকম দাঁড়ায়– নির্বাচনে ভোট প্রদান করা, সদস্য হয়ে সম্ভাব্য চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহকে সমর্থন দেওয়া, আইন প্রণেতার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা, রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং এভাবে আইন প্রণেতাদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অন্য নাগরিকদের সাথে মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামতের অভ্যাসগত আলোচনায় নিয়োজিত হওয়া প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সরাসরি তাৎপর্যমণ্ডিত করে।

> যদিও প্রত্যেক সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা অল্প কয়েকজন লোকের একচেটিয়া অধিকারে থাকে, তথাপি প্রত্যেক ব্যবস্থায় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি জনগণ কর্তৃক কিছু পরিমাণ অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করতে অত্যন্ত আগ্রহী থাকেন।... স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণের ধারণা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্ব লাভ করে, যা এটি বস্তুত দাবী করে।[১]

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ

নারীরা সরাসরি অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে[২] সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে শরণার্থী হওয়া নারীদের মধ্যে কেউ কেউ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভারত-শিবিরে স্থাপিত হাসপাতালে, নার্স হিসেবে, চিকিৎসক হিসেবেও কাজ করেছেন। দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করেছেন অনেকে। এই নারীরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক নানান উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হচ্ছে স্বাধীনতার পর

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী কলেজ, লক্ষীপুর

থেকে। এতোদিন ধরে মুক্তিযুদ্ধকালীন ত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকথায়, গবেষকদের অভিসন্দর্ভে, সাংবাদিকদের অনুসন্ধান-প্রতিবেদনে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, সেইসব ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান এবং ভূমিকা যথাযথ গুরুত্বে স্থান পাচ্ছে না।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিঃসন্দেহে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। এ যুদ্ধের যেমন একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে, তেমনি রয়েছে যুদ্ধ-পরবর্তী প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির খতিয়ান কিন্তু স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে রয়ে গেছে অনেক বিভ্রান্তি। আর এ কারণে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশের নাগরিকরা মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। বিষয়টি বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণও বটে। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বলা হয় 'জনযুদ্ধ'। এখানে প্রচলিত যুদ্ধের (Conventional War) পাশাপাশি গেরিলা পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে যেমন যুদ্ধ হয়েছে, তেমনি হয়েছে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নামের বাহিনীর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা। দেশের অল্পসংখ্যক মানুষ ছাড়া সবাই সে সময় কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অধিকাংশ বইপত্রে সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক ও নারীসমাজ ভীষণভাবে উপেক্ষিত।'[৩]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ববাংলার ওপর পাক হানাদার বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ হলো। তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করলো গ্রাম-নগর-বন্দর। ঘরে ঘরে তরুণ যুবকরা যোগ দিল যুদ্ধে।[৪] গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনি। তাদের খোঁজে বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশী শুরু হলো। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া গ্রামবাংলার লাখ লাখ পরিবারের নারীরা পাকবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা অবর্ণনীয় বর্বর অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। নির্যাতনের ভয়ে কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছেন। তখন ঢাকায় কবি সুফিয়া কামালের বাড়ির ওপর এবং তার গতিবিধির দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল। তার জীবন-সংশয়ের বিষয়ে ভিনদেশি প্রচার মাধ্যমেও খবর প্রকাশ হয়েছিল। পরে পাকবাহিনী নিজেদের সংকট বুঝতে পেরে সুফিয়া কামালকে বাধ্য করেছিল ঢাকা বেতার থেকে নিজ মুখে বলতে, যে তিনি বেঁচে আছেন ও ভালো আছেন।[৫] মুক্তিযুদ্ধের বছর জুড়ে নারীর জীবনে নেমে এসেছিল অভূতপূর্ব বিপর্যয়। যৌন নিপীড়ন, স্বাস্থ্যহানি, অনিরাপত্তা– এ সব মিলিয়ে নারীর জীবন হয়ে পড়েছিল দুর্বিষহ।[৬] মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হানাদার বাহিনীর দ্বারা প্রায় ১৪ লাখ নারী নির্যাতিত বা নিঃস্ব হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৪ লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছেন।[৭] এদেশের গ্রামীণ নারীরা কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিল। বহু নারী বিভিন্ন ক্যাম্পে ও হাসপাতালে চিকিৎসা ও শুশ্রুষার বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে কবি সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে সুলতানা কামাল ও সাঈদা কামাল, ডাক্তার ডালিয়া সালাউদ্দিন, মিনু বিল্লাহ, খুকু আহমেদ, রেশমা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ডাক্তার সুলতানা জামানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নারীরা কল্যাণীর ক্যাম্পে আশ্রিত জনগণ ও শিশুদের দেখাশোনা করেছেন। তখন বিশেষ করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, ইউরোপ থেকে ক্যাম্প পরিদর্শনে আসা নারীদের

সাথে বাঙালি নারীসমাজের সখ্যতা গড়ে ওঠে। যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

যে কয়েকজন নারী মুক্তিযোদ্ধা সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে করুণা বেগম অন্যতম।[৮] তখন করুণার বয়স ছিল ১৮ বছর। তার স্বামী শহীদুল হাসান পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার পর প্রতিশোধ-পরায়ণ করুণা গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়কদের সহযোগিতায় করুণা বেগম গ্রেনেড, স্টেনগান ও রাইফেল চালানো ছাড়াও যে-কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। কালক্রমে তার অধীনে আরো ৯ জন নারী অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে আহত এই নারী মুক্তিযোদ্ধার প্রশংসা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাহমান একটি পত্র লেখেন। পত্রটি নিম্নরূপ[৯]:

শেখ মুজিবুর রাহমান
প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী
গণভবন, ঢাকা

প্রিয় বোন করুণা,
বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহসিকতা ও নির্ভিকতা দেখিয়েছ তা দুনিয়ার ইতিহাসে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই দেশ আজ তোমার জন্য গর্বিত। দেশকে স্বাধীন করার যে মহান দায়িত্ব তোমরা পালন করেছ সেজন্য বাঙালিরা তোমাদের কাছে চিরঋণী।
তাই বাংলাদেশ সরকার, জনগণ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।
শুভেচ্ছা রইল।

(শেখ মুজিবুর রাহমান)

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায়। এই ঘটনার তাৎপর্য আবিষ্কারে বিভিন্ন রকম কার্যক্রমও পরিচালিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দলিলপত্র' ১৫ খণ্ডে বেরিয়েছে। সংস্করণও হয়েছে। কোনো কোনো সংস্করণ প্রত্যাহার করে আবার নতুন করে সংশোধন সংযোজন হয়েছে।[১০] অনেকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ আছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে। এগুলোও ইতিহাসের উপাদান। গত কয়েক বছরে মুক্তিযুদ্ধে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ, ধর্ষিত নারী এবং আহত নারী মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, অঞ্চলের ঘটনাবলী, সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্রসহ বিভিন্ন তথ্য এইসব গবেষণাকর্মকে সহায়তা করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুকুন্দপুর গ্রামের সায়রা খাতুন স্ব-প্রণোদিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য প্রদান করতে এগিয়ে আসেন।[১১] তার পিতা ছিলেন কুখ্যাত রাজাকার আজিজ চৌকিদার। সে মুতা বিয়ের নামে সায়রাকে জোরপূর্বক আর্মি ক্যাম্পে পাঠাত। পাকিস্তানি সেনা ছাউনীতে অবাধ যাতায়াতের সুযোগে মুক্তিকামী সায়রা পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের সমস্ত তথ্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সরবরাহ করতেন। প্রথম দিকে বাধ্য হয়ে সেনা-ব্যারাকে গেলেও পরে তিনি মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য তা কৌশল হিসেবে

প্রয়োগ করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি এই কাজ করেছেন। তার কাছ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা-বিষয়ক তথ্য পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণের চূড়ান্ত নকশা প্রণয়ন করেন।

এ কথা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের আপামর জনগণের সাথে অনেক গ্রামীণ নারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আবার অনেকে গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এ দেশীয় দোসররা এলাকার যুবতীদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন করে হত্যার পর নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে– এসব তথ্য জেনে এবং চোখে দেখে বাগেরহাটের মেহেরুন্নেসা মিরা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।[১২] ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং বাগেরহাটের চুরুলিয়া বিষ্টুপুর স্কুলের মাঠে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী শিবিরে যোগ দেন। মিরা প্রাথমিক অবস্থায় হাতবোমা নিক্ষেপ এবং মাইন স্থাপন-বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে রাইফেল চালনা বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

যশোরের বাঘাপাড়ার কৃষক মীর সৈয়দ আলীর মেয়ে ১৭ বছর বয়সের ফাতেমা খাতুন সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে ট্রেনিং নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তারপর পাকসেনারা তাকে বন্দি করে যশোর ক্যান্টনমেন্টে আটকে রাখে। ৬ ডিসেম্বর যশোর শত্রুমুক্ত হলে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করেন। তার আগ পর্যন্ত অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন ফাতেমা। যুদ্ধে অংশগ্রহণ বিষয়ে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের কিছু কথা উদ্ধৃত করছি–

> আমি ছিলাম বাঘাপাড়া যুদ্ধে, তারপর পেয়ারাপুর ব্রিজ ভাঙল তখন ছিলাম। আমাদের গ্রামে পানজাবি আসবে– তাই ব্রিজ ভেঙে ফেলেছিলাম। ব্রিজটা ছিল পেয়ারাপুর (বাঘারপাগার উত্তর দিকে)। আমাদের সাথে পাকিস্তানিদের কয়েক জায়গায় যুদ্ধ হয়। সিরামপুর (শ্রীরামপুর) ইসকুলি (স্কুলে) যুদ্ধ হয়। সেখানে আমরা ৩ জন ধরা পড়ি (আমি ফাতেমা, হালিমা আর রোকেয়া)। আর সেখানে আরও ধরা পড়ে দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা। এবং সেই দেড়শ লোককে গুলি করে মেরে ফেলে।[১৩]

নারী মুক্তিযোদ্ধার মূল্যায়ন

বাঙালি সাধারণ নারীর পক্ষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। পরিবার-প্রতিবেশসহ অনেক কিছুই মোকাবেলা করতে হয়েছে তাদেরকে। তারপরও কেউ কেউ দেশের প্রয়োজনে, সময়ের আহ্বানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। এটি ছিল অনিবার্য। যেমন গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার নীলিমা আহমদ। ইচ্ছা, বোধ আর পর্যবেক্ষণই ছিল তার যুদ্ধে যাওয়ার প্রধান প্রেরণা। পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস অত্যাচার তখনকার সমাজে মানুষের বয়স কিংবা নারী-পুরুষ পরিচয় প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছিল। হানাদারদের বিরুদ্ধে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রত্যয় মনে ও বুকে ধারণ করেছিল। যে যেভাবে পেরেছে যুদ্ধে এবং যোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে। নীলিমা

আহমদও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি মূলত মায়ের প্রেরণায় যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। তার মা ছিলেন শিক্ষক– অত্যন্ত সমাজ-সচেতন মানুষ; তিনি সবসময় দেশের কথা বলতেন। বলতেন, দেশের জন্য জীবন দিতে হলে কেউ যেন কখনো পিছ-পা না হয়। একটা সময় এলো। যখন দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেশ স্বাধীন করতে হলে যুদ্ধে যেতে হবে। আহ্বান এলো বিভিন্ন মাধ্যমে। নীলিমার মা বললেন– 'আমার ৯টি সন্তান। তাদের থেকে দেশের জন্য যদি দুয়েকজন প্রাণ দেয় তাহলে আমার আফসোস থাকবে না। তাহলে অন্তত দেশের আর সব মানুষ মুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে। আমারও অন্য সন্তানেরা মুক্ত থাকতে পারবে।'[১৪] কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্থাপিত ক্যাম্পে আহতদের সেবার কাজে যোগ দেন। তাকে সহযোগিতা করেছিল নার্সিং পড়া পদ্মা রহমান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কল্পনা রানী দেব[১৫] যোগ দিয়েছিলেন আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে।

মুক্তিযুদ্ধে গ্রামীণ নারীর অবদান বিষয়ে রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যায়ন আজও নানান প্রশ্নের সম্মুখীন। বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডের জনগণ ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সেই আন্দোলন-সংগ্রামের ফলেই ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। নতুন রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। সেই শাসন-প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার আগুন এ দেশের জনগণের সংগ্রামকে অগ্নিমুখর করেছে বিশ শতকের ৫০ ও ৬০-এর দশক জুড়ে। সেই সংগ্রামে এ দেশের নারীরা প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। অবিভক্ত ভারতে যেমন তারা যুক্ত ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে, তেমনই তেভাগা আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন এবং সামরিক দমননীতির বিরুদ্ধে সংঘটিত ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানএবং সত্তরের গণ-আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ– প্রতিটি সংগ্রামী কার্যক্রমের সাথেও তারা সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থেকেছেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় দেশের ভেতরে এবং দেশের বাইরে শরণার্থী হিসেবে পালন করেছেন বহুমাত্রিক ভূমিকা।

> মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এতটাই ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিস্তৃত যে, জনগণ, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী, বুদ্ধিজীবী-গবেষক, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-জনতা, নারীসমাজ– সবারই মুক্তিযুদ্ধে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি এত বিশাল ব্যাপক যে, স্বীকার করতে দোষ নেই,তার সার্বিক ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি। এই যুদ্ধে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই তারা তাদের কথা লিখেছেন। সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ছাড়াও দেশের ভেতরে থাকা নারী ও পুরুষের একটা ব্যাপক অংশ দেশের ভেতরে থেকে সংগ্রাম করে, আত্মত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করতে সাধ্যমতো ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু তাদের কথা আজও অকথিত রয়ে গেছে।[১৬]

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমি কয়েক শত বছরব্যাপী বিস্তৃত। সেই বিস্তৃত সময়-পরিসরের অঙ্গীভূত অংশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের সংগঠনে ও তার বিজয়ে নারী জনগোষ্ঠীর অবদান পুরুষের তুলনায় কম নয় বরং সমকৃতিত্বেরই পরিচয়বাহী, সেটা আজ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত সত্য। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি ধাপেই সৃজনশীল,

দক্ষ, অকুতোভয় বীর, যোদ্ধা ও সংগঠক হিসেবে নারীর অবদান তথ্যসমৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও পুরুষের ভূমিকা যেমন দৃশ্যমান, তেমন দৃশ্যমান নয় নারীর ভূমিকা ও অবদানের বিষয়টি। যুগ যুগ ধরে নারীকে অদৃশ্য রাখা এবং নারীর ইতিবাচক ভূমিকা ও পরিচয়কে অদৃশ্য করে রাখার মধ্য দিয়ে নারীসমাজকে মূলধারার সমাজমানস থেকে, প্রকারান্তরে ইতিহাস থেকে বিস্মৃত করে রাখার একটা প্রচ্ছন্ন অপচেষ্টা বিরাজমান।

> ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতাযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের দুই লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়।[১৭]

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নারীর অবদানের কথা সেভাবে তেমন একটা সামনে আসেনি। তখন কেবল মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত এবং সদ্য-বিধবাদের পুনর্বাসনের দিকেই ছিল সকলের দৃষ্টি। স্বীকৃতি না পেয়ে তখন নারীরা পেয়েছিল সহানুভূতি। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্র তখনও নারীর ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতির জন্য অনুকূল হয়ে ওঠেনি। "মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ সরকার নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবেও এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এঁদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।"[১৮] মুক্তিযুদ্ধে গ্রামীণ নারীর ভূমিকা ও অবদান সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম ১৯৭২ সালে শুরু করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ [*সাধারণ সম্পাদিকার (কেন্দ্রীয় কমিটি) রিপোর্ট*, ঢাকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জাতীয় সম্মেলন (১৯৭২-২০০০)]। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারীগ্রন্থ 'প্রবর্তনা' আয়োজিত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য সচেতন সমাজের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। 'মা-বোন-স্ত্রী-মেয়েদের শুধু শোকার্ত হিসেবে দেখা হয় কেন? ২. মুক্তিযুদ্ধ কেন শুধু সেনাদের ব্যাপার হয়ে উঠেছে? ৩. বন্ধুক হাতে না নিলে মুক্তিযোদ্ধা হয় না– এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে কেন? ৪. স্বামী-সন্তান যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে বলে মা ও স্ত্রীকে গৌরবান্বিত করা হয়, কেন তার নিজের অবদানকে দেখা হয় না।'[১৯]

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে কারো কারো সংশয় থাকলেও তারা যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামী ছিলেন, তার তথ্য-প্রমাণ রয়েছে।[২০]একাত্তরে এ দেশে সাড়ে ৭ কোটি জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই ছিল নারী। তখনকার সমাজ ছিল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে মেয়েরা ছিল অন্তঃপুরবাসিনী। স্কুল-পড়ুয়া মেয়েদের সংখ্যা ছিল কম, কলেজ-পড়ুয়া আরো কম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেয়েদের সংখ্যা ছিল যৎসামান্য। পুরুষদের ধারণা ছিল–মেয়েদের এতো লেখাপড়ার প্রয়াজন নেই। চিঠি পড়তে ও লিখতে পারলেই হলো। বয়স ১২-১৩ হলেই পুরুষদের

সামনে যাওয়া নিষেধ। ব্যতিক্রম যা কিছু ছিল, তা কেবল শহর এলাকায়। গ্রামাঞ্চলে ১৩-১৪ বছর বা আরো কম বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল। একাকি চলাফেরা করা নিষেধ ছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কিন্তু ঘরের মেয়ে বাড়ি ফেরেনি, এ ছিল কল্পনারও বাইরে। এমন যখন আমাদের গ্রামীণ সমাজের অবস্থা, তখন আসে একাত্তর– আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের সময়। প্রতিকূলতার সব বাঁধ ভেঙে গ্রামীণ নারীরাও সামিল হয় এই মহান যুদ্ধে– সংগ্রামে, সক্রিয়ভাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কাকনা গ্রামের বেসানী, মনোয়ারা, রওশানআরা, কইতরী, ঠান্ডু, বছিরন, পূজারী তারুটিয়া গ্রামের হাজেরা, নূরুন্নাহার, ফেরু ছাড়াও অন্যান্য গ্রামের অশিক্ষিত অসহায় নারীরা পরিচিত-অপরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার তৈরি করে দিয়েছে, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছে, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। কখনো কখনো সম্মুখ সমরেও যোগ দিয়েছে।

লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে গাঁথা বেদনা-সিক্ত বিজয়ের এ এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস; বহু মানুষের হাজার বছরের সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত এক জীবন-আলেখ্য। সমুদ্র-উপকূলের যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে এইসব মানুষের জীবনের উদ্ভব, বিকাশ, বিলয় ঘটেছে আবহমানকাল ধরে, পৃথিবীর মানচিত্রে তা সহজে দৃষ্টিগোচর হবার নয়। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, সবুজের মনভোলানো বিপুল সমারোহ। খাল-বিল, নদী-নালা আর সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের দেশ। ছবির মতো ছোট ছোট গ্রাম। মানুষের অতি সাধারণ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় বিজড়িত সেইসব জনপদ, নগর, বন্দর। এখানে জীবন ছিল সুন্দরের বিপুল সম্ভাবনাময়। অথচ জীবনের পরিবেশ ছিল অশান্ত, অগ্রগতির পথে সৃষ্টি হচ্ছিল ব্যাপক অন্তরায়। প্রায় দুইশত বছর এই বাংলার মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে। ১৯৪৭ সালের পর শুরু হয় পাকিস্তানি শাসনের দৌরাত্ম্য। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় কেঁপে উঠেছিল বাংলার গ্রাম ও গঞ্জ।

> যেসব গ্রাম গেরিলাদের আসা-যাওয়ার পথে, সেখানকার জনগণকে সবচাইতে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কারণ গ্রামের জনসাধারণের সম্পদ সাধারণত সীমিত, অথচ এসব গ্রাম হয়ে প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া করেছে বিপুল-সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা। সীমিত সম্পদ ও সম্বল দিয়েই যোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া এবং খাদ্যের সংস্থান করতে হয়েছে গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষদের।[২১]

নারী, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ, সংস্কৃতি– এসবই দেশের অস্তিত্ব ও মর্যাদার প্রশ্নে একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একেবারে ভেতরের বিষয়। মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিলে বাঙালি জাতির এবং বাংলাদেশের কোনো অস্তিত্বও নেই। আর এই অহংকারের সাথে আমাদের নারী সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে এদেশের নারী সশস্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি গণবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে সরাসরি রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে অবদান রাখতে সক্ষম হন। যে সকল নারী রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন তারা প্রথমে ব্যক্তিগত গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের অধীনে, কিংবা সাব-সেক্টর কমান্ডারের অধীনে থেকে কিংবা নিয়মিত বাহিনীর অধীনে থেকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কোনো কোনো সময়ে নারীরা দলের

নেতৃত্ব দিয়ে পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে সফলতা লাভ করেন। অনেক নারী অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে যুদ্ধ না করলেও পুরুষ সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ বহন করে, কিংবা যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকারে হামাগুড়ি দিয়ে খাদ্য ও গোলাবারুদ পৌছে দিয়ে পুরুষ সহযোদ্ধাদের নানানভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

পরোক্ষ অংশগ্রহণ: আশ্রয় ও সেবা প্রদান

সশস্ত্র যুদ্ধে সংখ্যার বিচারে এদেশের নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে না পারলেও তাদের সার্বিক ভূমিকা অস্বীকার করা চলে না। যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা যখন দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে হানাদার কবলিত এলাকায় পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, তখন আহার, বিশ্রাম এবং অতর্কিত শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এদেশের মুক্তিকামী নারীরা গ্রামে-গ্রামে নানানভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের ঘরে, বাথরুমে, গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে পাকসেনা রাজাকার-আলবদরদের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রয়োজনে তারা আশ্রিত ব্যক্তিদের স্বামী ও নিকট আত্মীয় বলে পরিচয় দেন।

পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের হাতে নির্যাতন এবং নির্মম মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করেও এ দেশের মানুষ যুদ্ধরত প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছে, পাকিস্তানিদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত রেখেছে সার্বক্ষণিকভাবে। দীর্ঘ যাত্রার পথে অথবা সামরিক অভিযান শেষে কিশোর, তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যখন বিশ্রামরত অথবা ক্লান্ত অবসন্নতায় ঘুমিয়ে পড়েছে, বাংলার মা-বোনেরা তখন সতর্ক দৃষ্টি রাখছে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের গুপ্তচরদের গতিবিধির উপর। ব্যস্ত রয়েছে গভীর রাত জেগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরির কাজে। এ কঠিন দায়িত্ব বাংলার মা-বোনেরা হাসিমুখে পালন করে গেছেন প্রতিদিন, প্রতিরাত– মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসজুড়ে। কারণ যুদ্ধের এই ন'মাসের পুরো সময়টাই প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের দল, একের পর এক– পাকিস্তানিদের উপর আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে। যেসব গ্রাম গেরিলাদের আসা-যাওয়ার পথে, সেখানকার জনগণকে সবচাইতে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কারণ গ্রামের জনসাধারণের সম্পদ সীমিত, অথচ এসব গ্রাম হয়ে প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া করেছে বিপুল-সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা। সীমিত সম্পদ ও সম্বল দিয়েই যোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া এবং খাদ্যের সংস্থান করতে হয়েছে গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষদের।[২২] যুদ্ধকালীন এদেশের অনেক নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সে সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র নারীরা গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। গ্রামের মহিলাদের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা পরিকল্পনা অনুযায়ী অপারেশন চালিয়ে সাফল্য অর্জন করেন এবং আমাদের বিজয় অর্জন অত্যন্ত সহজতর হয়। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়তে গিয়ে আহত হন। এসব আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রুষার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে ও

বাইরে হাসপাতাল ও ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। এ সকল হাসপাতালে পুরুষের চাইতে নারীরা বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর সশস্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মুক্তিবাহিনীর নারীরা গ্রামে-গঞ্জে নানানভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। বাংলার প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি বাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় স্থল। যখনই কোনো মুক্তি যোদ্ধারা আশ্রয় চেয়েছেন তখনই আশ্রয় দিয়েছেন নারী সমাজ। এ সকল ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অনেকেই পাকসেনা ও রাজাকারদের আক্রমণের স্বীকার হতে হয়েছে। এরূপ আন্তরিকতা ও উৎসাহ মুক্তিযোদ্ধাদের মনে যে শক্তির সঞ্চার করে তারই ফল আমাদের স্বাধীনতা।

> পাটগ্রামের বুড়িমারীতে ছিল ৬ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর, বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ভিতর। এই সেক্টর সদরই একমাত্র যেটি গোটা যুদ্ধকালীন সময় বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থিত ছিল। সেক্টর সদর দপ্তর সংলগ্ন একটি স্কুলে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। টিনের ছাদ, তারপরও সুন্দর আয়োজন। মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সবকিছুরই অভাব, প্রত্যন্ত অঞ্চল এতকিছুর পরও মেয়েরা বিস্মিত হল। সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেনকে দায়িত্ব দিলেন ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারক করার। আলাদা প্রহরা বসানো হলো তাদের বাসস্থানের চতুর্দিকে। মেয়েদের ক্ষুদ্রাস্ত্র (রাইফেল, এসএমজি, এলএমজি) এবং বেসিক নার্সিং এর প্রশিক্ষণ দেয়া হল। উইং কমান্ডার বাশারের মাথায় এই মেয়েদের নিয়ে তখন অনেক পরিকল্পনা। এই ছয় জন মেয়ে আর তখন অন্তঃপুরবাসিনী নয়। তারাও মুক্তিযোদ্ধা। শুধু নামে এবং লোক দেখানোর জন্য নয়, সকল অর্থেই। তারা তখন এতই নিবেদিত যে এ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে তারা দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে না।[২৩]

নারী জাগরণ ও নারী-আন্দোলনের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি সাদৃশ্য-সূত্র রয়েছে। যা কখনো চোখে পড়ে, কখনো পড়ে না। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং ভাঙা-গড়ার মধ্যে জনসংখ্যার এ অর্ধেকাংশের জীবন কীভাবে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে, সে ইতিহাস অনেকটাই অজানা। সমাজ-বিবর্তনের ধারায় বাংলার পশ্চাৎপদ নারীরা কীভাবে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে প্রয়াসী হলো তার রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাজনীতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর আগমনের পথটি শুরু থেকেই ছিল সংকটাপন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। নারীদের তৎকালীন সময়ে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে এতই অসহায় দুর্বল, অধিকারহীন, পরনির্ভর নিরক্ষর ও অক্ষম করে রাখা হয়েছিল যে, নিপীড়িত হয়েও নিজেদের মুক্তির কথা ভাবতে পারেনি। কারণ নারীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল না। রাজনৈতিক চেতনাবোধ নারীদের মাঝে তখনও তেমনভাবে জেগে ওঠেনি। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের অসন্তোষ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সংগঠিত হয় গণ-অভ্যুত্থান। গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিলে ব্যাপক সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী এতে অংশ গ্রহণ করে। শহরে শহরে নারী জাগরণ দেখা যায়। কিন্তু গ্রাম-বাংলার নারী সমাজ তখনও নির্লিপ্ত। বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করে যেমন নিঃসন্দেহে বলা যায় ১৯৫২ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক

চেতনার জন্ম হয়, ঠিক তেমনি ভাবে বলা যায় মুক্তিযুদ্ধকালীন অর্থাৎ নয় মাস যুদ্ধ চলার সময়ে গ্রামীণ নারী সমাজের রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয়।

৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন, ইতিহাস বিকৃতির প্রচেষ্টা, এ ছাড়াও নানান কারণে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান সম্পর্কিত পাঠ্য পুস্তকের অভাবের কারণে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ২৭ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবিকে বীর প্রতীক সম্মাননা প্রদান করা হয়। এমনিভাবে এই দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় কত নারী মুক্তিযোদ্ধা হারিয়ে গেছেন তা আমাদের জানা নাই। স্বাধীনতাযুদ্ধে সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকভাবে উৎসাহ প্রদান করে, তথ্য সংগ্রহ করে ও সহায়তা করে, স্বাধীন বাংলা বেতারে গান গেয়ে, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে অসংখ্য বীরাঙ্গনা নারী মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন।

মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন ছাড়াও ভাই হত্যা, পরিবারের অপরাপর সদস্য হত্যা কিংবা অসংখ্য বাঙালি হত্যার প্রতিশোধ নিতে বাংলাদেশের অগণিত গ্রামীণ নারী রাজনৈতিক চেতনায় জাগরিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করলেই মুক্তিযোদ্ধা হবে এমন কোনো কথা নেই। মুক্তিযুদ্ধে যারা আশ্রয় প্রদান, অনুপ্রেরণা দান, খাদ্য প্রদান, তথ্য প্রদান, যোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা। যোদ্ধাদের আশ্রয় প্রদান, সেবা, খাদ্য প্রদান, তথ্য প্রদান করে আহত যোদ্ধাদের সেবা করা, তথ্য প্রদান করে সাহায্য করার ব্যাপারে বিশাল অবদান রাখেন বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী সমাজ। স্বাধীনতাযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়ে যুদ্ধ করেন। অনেক নারীর নাম হয়তো আমরা জানি না। সরাসরি অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করায় বীর খেতাব অর্জন করে কাকন বিবি, তারামন বিবি ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারীরা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে, কবিতা পড়ে, সংবাদ পাঠ করে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। মুক্তিযোদ্ধারা যে গ্রামেই যুদ্ধে গেছেন সেখানেই নারীরা তাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। অভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন বাংলার গ্রামীণ নারীরা। ধনী পরিবারের মতো দরিদ্র পরিবারের নারীরাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান করে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। গ্রামীণ নারীদের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রাম অঞ্চলে বীরদর্পে যুদ্ধ করতে পারত না। তথ্য সংগ্রহ এবং আদান-প্রদানের কাজে নারীরা পুরুষের চেয়ে অধিক দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। আর এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর অবদান অনস্বীকার্য। তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আর এ কাজে বরাবরই সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন গ্রামীণ নারীরা। আর সারা দেশে এমন বার্তা-সংগ্রহকারী নারীর সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদান। বাংলাদেশের নারী-সমাজকে সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগী ও সাহসী গ্রামীণ নারীর অবদান বেশি। নারীরা স্বভাবতই সেবা-প্রদান মানসিকতার অধিকারী। আহত যোদ্ধারা সেবা ও মমতা পেয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুর বিরুদ্ধে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মতো অনেক জননী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের সন্তানদের যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। অনেক স্ত্রী তাদের স্বামীকে যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সামাজিকভাবে গ্রামীণ নারীরা বরাবরই উপেক্ষিত। ফলে তাদের এ সচেতনতা শহরের নারীদের মতো কখনও আলোচনায় আসেনি। নারীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে কোনো ব্যাপকতর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। তারা চেয়েছেন নারীরা অস্ত্রের বদলে ট্রেনিং নিয়ে আহত যোদ্ধাদের সেবা প্রদান করুক। পুরুষের সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের শক্তি সামর্থ্যকে সীমিত করে রাখার পক্ষে জাতীয় মতামত ছিল। যেসব গ্রামীণ নারী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের অধিকাংশ নারীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ট্রেনিং নেওয়ার ক্ষেত্রে, অস্ত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে নারীরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। আবার অনেক নারীই পরিবারের অনিচ্ছার কারণে বা স্বামীর বাধার ফলে মুক্তিযোদ্ধোদের সেবা প্রদান হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন। নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ নারীরা মক্তিযুদ্ধে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ত্রিশ কোটি প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল তা হয়তো সম্ভব ছিল না, যদি গ্রামীণ নারী সমাজ রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা সুস্থ করার কাজে নিয়োজিত না থাকতেন। কাজেই নিজের প্রাণকে সংকটাপন্ন করে যে সকল গ্রামীণ নারীরা রাজনৈতিক চেতনায় বিকশিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধোদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন, তারা সবাই যোদ্ধার মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার যোগ্যতা রাখেন। জাতি গঠনের কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্তির ব্যাপারটি খুব জোরালো আলোচিত না হলেও এর প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিক পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে এখন গবেষকদের আগ্রহ বাড়ছে।

> যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন নারী। যখন থেকে পৃথিবীতে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন থেকেই নারীরা বিপন্ন। পরাজিতদের ওপর আক্রোশ মেটানোর জন্য বিজয়ীরা লুটপাট, হত্যার সঙ্গে ধর্ষণের বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেয়। নারী ধর্ষিত হয়, লুণ্ঠন করা হয়, যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সবশেষে আশ্রয় মিলে হয়তো গণিকালয়ে। আমাদের নবী (দ:) থেকে জেনেভা কনভেনশন সবখানে যুদ্ধের কিছু নিয়মনীতি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। নারী এবং শিশু নির্যাতন যাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কিন্তু কেউ মানেনি। সভ্য বলে যারা নিজেদের দাবি করে তারাও না। আক্রমণকারীরা দমন করার জন্য সাধারণত দুটি অস্ত্র একই সঙ্গে ব্যবহার করে, একটি গণহত্যা, অপরটি ধর্ষণ।১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানি সেনারা যেখানে গিয়েছে সেখানেই গণহত্যা ও ধর্ষণ চালিয়েছে। জাপানিদের 'নানকিং ম্যাসাকার' তো বিখ্যাত। চীন ও কোরিয়ায় জাপানিরা শুধু গণধর্ষণ নয়, নারীদের বন্দি করে রেখেছে যৌনদাসী হিসেবে, আধুনিক ভাষায় যাদের কমফোর্ট উইম্যান হিসেবে অভিধা দেওয়া হয়েছে। জাপানিরা শুধু চীন কোরিয়াতেই নয়, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসেও একই কাজ করেছিল। একই

> সময় বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে জার্মান বাহিনী একই ধরনের কাজ করেছে। ১৯৭১ সালের আরো পরে বসনিয়ায় সার্বিয় বাহিনি, রুয়ান্ডায় টুটসিদের ওপর হুতুদের হত্যা ও ধর্ষণের কথা সুবিদিত। অন্তিমে, কোনো জাতিকেই দমন করা যায়নি, কিন্তু অজস্র নারীর জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার।[২৪]

মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের অংশগ্রহণ যেমন তাদের জন্য বড় মাপের একটি অর্জন, তেমনি আজকের বাংলাদেশে নারী জাগরণের যে মাত্রা অর্জিত হয়েছে তার শেকড় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রোথিত। আর যাই হোক, পরাধীন ও স্বাধীন দেশে নারী জাগরণের মাত্রার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে যে নারী জাগরণের ব্যাপ্তি তা '৭১-পূর্ব বাংলাদেশে সম্ভব ছিল না। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের কাছে অন্য সব কিছুর যেমন তেমনি নারী জাগরণেরও ঋণ অনস্বীকার্য।

> মুক্তিযুদ্ধে নারীদের একটি বড় অংশ অবদান রেখেছে সেবামূলক কাজে। যেভাবে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে নারীরা কাজ করেছিল তা চিরস্মরণীয়। অন্যদিকে গ্রামের নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার তৈরি যে মায়া/ মমতা/ স্নেহ নিয়ে করতেন তা চিরজীবন মনে রাখার মতো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডেও নারীর অংশগ্রহণ– অনুষ্ঠানকে প্রাণ দিয়েছিল।[২৫]

পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান-সহমর্মিতা এবং সম্মিলিত সংগ্রাম বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য। পরিবারের ক্রম-অগ্রগমন, সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তন আর রাষ্ট্রভূমির প্রতি দায় ও দায়িত্বের প্রশ্নে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে সব সময়। নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত আত্মত্যাগের ফসল এই বাংলাদেশ। তবে এককভাবে যখন নারীর প্রশ্নটি আসে, তখনও দেখা যায় নারীর আত্মাহুতি বা আত্মত্যাগ এখানে যথেষ্ট। কিছু পাবার প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ সব সময় কাজ করে, তা নয়। মহৎ কাজের মূলে থাকে মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। মুক্তিযুদ্ধে যারা মারা গেছেন তারা চিরঞ্জীব। কিন্তু যে নারীরা কাছের মানুষকে হারিয়ে বেঁচে আছেন– চলমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদেরকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে স্মৃতির সাথে, বাস্তব জীবনের টানাপড়েনের সাথে। যে নারীরা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর যে নারীরা তাদের স্নেহের কোমল পরশ বুলিয়েছেন আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা দেশত্যাগী ছিন্নমূলদেরকে, তাদের সবার অবদানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো বাংলাদেশ।

> পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের হাতে নির্যাতন এবং নির্মম মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করেও এ দেশের মানুষ যুদ্ধরত প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছে, পাকিস্তানিদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত রেখেছে সার্বক্ষণিকভাবে। দীর্ঘ যাত্রার পথে অথবা সামরিক অভিযান শেষে কিশোর, তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যখন বিশ্রামরত অথবা ক্লান্ত অবসন্নতায় ঘুমিয়ে পড়েছে, বাংলার মা-বোনেরা তখন সতর্ক দৃষ্টি রাখছে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের গুপ্তচরদের গতিবিধির উপর। ব্যস্ত রয়েছে গভীর রাত জেগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরির কাজে। এ কঠিন দায়িত্ব বাংলার মা-বোনেরা হাসিমুখে পালন করে গেছেন প্রতিদিন, প্রতিরাত– মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস জুড়ে। কারণ যুদ্ধের এই নয় মাসের পুরো সময়টাই প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের দল, একের পর এক– পাকিস্তানিদের উপর আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে।[২৬]

যুদ্ধের সময় নারীরা হয়ে পড়ে অসহায়। তারা অত্যাচারিত হয় বেশি। যে-কোনো যুদ্ধের ক্ষেত্রেই কম-বেশি এই কথা সত্য। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর ব্যাপকতা পৃথিবীবাসীকে হত-বিহ্বল করে দিয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় সহযোগী রাষ্ট্র ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে ১৫ দিন সংশ্লিষ্ট একজন ভিনদেশি সংবাদদাতার নোটখাতায় দ্রুত লিপিবদ্ধ বিবরণ থেকে খানিকটা পাঠ নিচ্ছি–

> ডিসেম্বর ৮: যাওয়া হলো যশোরে, যেখানে জনগণ স্বাধীনতার গোটা একটা দিন প্রথমবারের মতো উপভোগ করছেন। কলকাতা থেকে জিপে করে ৮০ মাইল পথ অতিক্রমকালে গ্রামবাসীরা উল্লসিত হয়ে এগিয়ে এসেছে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। কোথাও কোনো তরুণী চেখে পড়ে না। কেননা তাঁরা হয়েছিল পাকিস্তানিদেরযৌন-নৃশংসতার শিকার এবং ভারতের শরণার্থী শিবির অথবা লুকনো আশ্রয় থেকে বের হয়ে তাঁরা ফিরছে সবার শেষে।[২৭]

আধুনিক সভ্যতার জ্ঞানজগতে 'নারী ও রাজনীতি' একটি নতুন প্রসঙ্গ। বর্তমানে 'নারী ও রাজনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে নারী ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্র দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে।'[২৮]রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রমের একটি অনুক্রম, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে। এই প্রক্রিয়ার ভেতর রয়েছে শাসক-নির্বাচন এবং জননীতি প্রণয়নের বিভিন্ন দিক। আরো স্পষ্ট করে বললে এরকম দাঁড়ায়– নির্বাচনে ভোট প্রদান করা, সদস্য হয়ে সম্ভাব্য চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহকে সমর্থন দেওয়া, আইন প্রণেতার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা, রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং এভাবে আইন প্রণেতাদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অন্য নাগরিকদের সাথে মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামতের অভ্যাসগত আলোচনায় নিয়োজিত হওয়া প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সরাসরি তাৎপর্যমণ্ডিত করে।

> রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যদিও প্রত্যেক সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা অল্প কয়েকজন লোকের একচেটিয়া অধিকারে থাকে, তথাপি প্রত্যেক ব্যবস্থায় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি জনগণ কর্তৃক কিছু পরিমাণ অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করতে অত্যন্ত আগ্রহী থাকেন।... স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণের ধারণা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্ব লাভ করে, যা এটি বস্তুত দাবি করে।[২৯]

নারীর প্রতিনিধিত্ব

স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করানোর অন্যতম একটি পূর্ব শর্ত হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজও নারীর অবস্থান জোরালো হয়নি। অথচ স্বাধীন বাংলাদশের অভ্যুদয়ে নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক বিকাশ প্রয়াসে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের সংবিধানে নারীর স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদিতে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৫ বছরেও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর উপস্থিতি অত্যন্ত কম লক্ষণীয়।

রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ সীমিত হওয়ার কারণে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতেও নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই। অথচ নারীবিহীন রাজনীতি কোনো রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। যতদিন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হবে, ততদিন রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় নারীর সমস্যার স্বরূপ এবং তা সমাধানের বিষয়টি থাকবে অনুপস্থিত। তাই রাজনীতিতে নারীর অংশীদারীত্ব এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হওয়া জরুরি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঘটেছে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নিঃসন্দেহে ঐসব অংশ গ্রহণের ইতিহাস ছিল গৌরবোজ্জ্বল। আর গৌরবোজ্জ্বল সেই ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই তৈরি হয়েছে হালের নারীর রাজনীতির ভিত। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৪৭ বছরের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় নারী নেতৃত্বের অধীনে শাসিত এবং সামরিক শাসনামল বাদ দিলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। তথাপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতির ভিত্তিতে নারীরা পুরুষের ন্যায় ভোটাধিকার লাভ করেছে। তারপরেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর প্রবেশাধিকার অনেকটা রুদ্ধ। নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তাদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশের কতসংখ্যক নারী সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন তার সঠিক কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। যদিও এ হিসাবটি করা যেতে পারে বিভিন্ন উপায়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও ব্রিটিশ শাসনের আগে বা পরে নারীরা ছিল পশ্চাৎপদ। নগরায়ন ছিল অত্যন্ত সীমিত। মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করত এবং এদের উপার্জনের প্রধান উৎস ছিল জমি তথা কৃষি। ব্রিটিশ আমলে গতানুগতিক ধারায় বিশ্বাসী নারীরা অধিকার সচেতন বা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল না। ধর্মীয় অনুভূতি এবং সামাজিক প্রথা দ্বারা নারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হলেও গৃহকর্মের পাশাপাশি পুরুষ সদস্যদেরকেও কৃষিকাজে ও বস্ত্রশিল্পে সহায়তা করত ।

১৯৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী (২৫ বছর পূর্তি) পালিত হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কাজ করার জন্য গঠিত হয়েছে ‘মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ’। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে শরণার্থী হওয়া নারীদের মধ্যে কেউ কেউ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভারত-শিবিরে স্থাপিত হাসপাতালে, নার্স হিসেবে, চিকিৎসক হিসেবেও কাজ করেছেন। দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করেছেন অনেকে। এই নারীরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক নানান উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকে। এতোদিন ধরে মুক্তিযুদ্ধকালীন ত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকথায়, গবেষকদের অভিসন্দর্ভে, সাংবাদিকদের অনুসন্ধান-প্রতিবেদনে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, সেইসব ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান এবং ভূমিকা যথাযথ গুরুত্বে স্থান পাচ্ছে না।

স্বীকৃতি ও পুনর্বাসন

নারীরা কেবল যুদ্ধে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন, তা নয়– যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অনেক নারীর জীবনের অভিযাত্রা ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ। শহীদ লে. কর্নেল মুহম্মদ আবদুল কাদিরের পুত্র বিশিষ্ট সাংবাদিক নাদীম কাদিরের স্মৃতি থেকে কিছু অংশ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি–

> ১৯৭১ সালে আম্মার বয়স ৩০-এর কাছাকাছি। অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু আম্মা তার স্বামীর আসন কাউকে দেননি। তার হৃদয়ে শুধু কর্নেল কাদির। অনেকে বুঝিয়েছেন একলা সন্তান মানুষ করা অনেক কষ্ট, কিন্তু আম্মা তার সম্পূর্ণ জীবন তার স্বামী এবং সন্তানদের উৎসর্গ করে দিয়েছেন।[৩০]

এইভাবে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়াও নারীর ত্যাগ বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত। আমাদের আজকের যে বাংলাদেশ, তাতে নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্তির এক অপরিসীম সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে উপাদান ও তথ্য-প্রমাণ। কারণ মুক্তিযোদ্ধারা তখন ভাবেওনি যে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য নারীরা পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে স্বীকৃতির বিষয়টিও তাদের মাথায় ছিল না। কিন্তু একথা ঠিক যে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন ছিল অসম্ভব। যদিও তখন রাজনীতিতে নারীদের সম্পৃক্ততা তেমন একটা ছিল না। তারা রাজনীতি বুঝতোও না। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ দেখে অনেক গ্রামীণ নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ খুব উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে না পড়লেও গোয়েন্দা বিভাগে তারা কর্মরত ছিল। বিভিন্ন গুরুত্বহ তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিপুলভাবে সহায়তা করেছে। প্রায় সকল বাড়ির নারীরাই সহায়তার হাত বাড়িয়েছিল। অনেকে সম্ভ্রমও দিয়েছে অসহায়ভাবে। বীরাঙ্গনারা সমাজে সমকালে স্থান পায়নি; গ্রাম থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে।[৩১] তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ নারী সমাজকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হলে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে আগামীর স্বপ্ন ও সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।

তথ্যসূচি

---

১ মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, (অনুবাদ : খান মো. লুৎফুর রহমান), *রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ৮৮

২ রাশেদুর রহমান (সম্পাদিত), *নারী ১৯৭১ : নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার*, (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, অক্টোবর ২০১৫,) পৃ. ২০৭। [১৯৭১ সালে শহীদ রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের স্ত্রী শোভারাণী মণ্ডল সাক্ষাৎকারে জানান : ১৭ বৈশাখ আমার স্বামীকে পাকিস্তানি বাহিনী ডেকে নেয়। এইভাবে আরো বহু

লোককে ডেকে নিয়ে নরেরকাঠি একটা খালের পাড়ে তাঁদের একত্রে দাঁড় করাইয়া গুলি করে।... আমার স্বামী নিহত হওয়ার পরে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই আমি পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি।... সিরাজ শিকদার এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিল। সে-ই আমাকে ট্রেনিং দিছে। সে-ই আমাকে বুঝাইয়া-শুনাইয়া মুক্তিবাহিনীতে নেয়।... আমরা ২২ জন একত্রে ট্রেনিং নিছি।... ১৮ জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা। প্রশিক্ষণের পর যখন খবর পেতাম যে আর্মি আসতেছে, তৎক্ষণাৎ আমরা সেখানে গিয়া ঝোপঝাড়ের ভিতরে, রাস্তার ধারে, গাছের আড়ালে বা পেয়ারাবাগান থেকে তাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করতাম। প্রথম পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ করা হয় কুরিয়ানা গ্রামের একটু নামায়। একটা স্পিডবোটে চারজন মিলিটারি (পাকিস্তানি সেনা) আসছিল একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পথে আমি গ্রেনেড নিক্ষেপ করি সেই স্পিডবোটের উপরে। তখন বোটটা ডুবে যায়। আরও লোকজন আমার সাথে ছিল, তারা ওদের ধরে ফেলে এবং বেয়নেট দিয়া কইচ্চা (ক্ষতবিক্ষত) নদীতে ফালাইয়া দেয়।]

৩ এ কে এম রিয়াজুল হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দিক*, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ২০১৭-১২-১০
Link : http://www.banglanews24.com/opinion/news/bd/623125.details

৪ মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১০; প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯), পৃ. ১৬২

৫ সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, (ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ৫১

৬ *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ৭৭-৭৮

৭ নারী পুনর্বাসন বোর্ডের (অধুনালুপ্ত) তৎকালীন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য, সূত্র : *মাসিক বেগম*, নূরজাহান বেগম সম্পাদিত, (ঢাকা : ডিসেম্বর ১৯৭২)

৮ কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বাংলার কিশোর মুক্তিযোদ্ধা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫), পৃ. ১০

৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১০ আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, (ঢাকা : নবরাগ প্রকাশনী, জুলাই ২০১৪),পৃ. ৩৪

১১ কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বাংলার কিশোর মুক্তিযোদ্ধা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫), পৃ. ৩০

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪ [মিরার জন্ম পিরোজপুরে। জীবিকার প্রয়োজনে তার বাবা তাছের উদ্দিন ১৯৬০ সালে পরিবারসহ পিরোজপুরে পাড়ি জমান। যুদ্ধ চলাকালে মাত্র ১৫ দিন সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মিরা ৯ নম্বর সেক্টর এলাকার বাগেরহাটের বিভিন্ন অপারেশনে মেজর তাজুল ইসলামের অধীনে অংশগ্রহণ করেন।]

১৩ সাক্ষাৎকার, বীরমাতা ফাতেমা খাতুন, 'শ্রীরামপুরের যুদ্ধে ধরা পড়ি', *সংগ্রামী নারী : ৫২ ও ৭১*, বাশার খান সম্পাদিত, (ঢাকা, ডেইলি স্টার বুকস, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ১৭৫

১৪ মোস্তফা হোসেইন, *কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সমগ্র*, (ঢাকা : ডেইলি স্টার বুকস, ফেব্রুয়ারি ২০১৭) পৃ. ১৮০

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

১৬ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া, 'লেখকের কথা', *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, (ঢাকা, র‌্যামন পাবলিশার্স, ১৯৯৯)

১৭ *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, (ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৯৭)

১৮ শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, (ঢাকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯৯), পৃ. ১৩

১৯ ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, (ঢাকা, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯১)

২০ রাশেদুর রহমান (সম্পাদিত), *নারী ১৯৭১*, পৃ. ৮

২১ ইসলাম, রফিকুল, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, পরিমার্জিত দশম মুদ্রণ জুলাই ২০১৬ (প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৮১), ঢাকা, পৃ. ২৫

২২ ইসলাম, রফিকুল, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

[২৩] মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া, *একাত্তরের কন্যা জায়া জননীরা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

[২৪] মামুন, মুনতাসীর, *বীরাঙ্গনা* ১৯৭১, সুবর্ণ, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ (ঢাকা: প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩), পৃ. ১১

[২৫] হোসেন, শওকত আরা, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯), পৃ. ৩৪

[২৬] *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পূর্বোক্ত, ('ভূমিকা') পৃ. ১৪

[২৭] শনবার্গ, সিডনি, *ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান*, (মফিদুল হক অনূদিত), সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ১৪৭

[২৮] আহমেদ, ইয়াসমিন, ও বর্মণ, রাখী, *নারী ও রাজনীতি*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩

[২৯] মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, (অনুবাদ : খান মো. লুৎফুর রহমান), *রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ৮৮

[৩০] নাদীম কাদির, *মুক্তিযুদ্ধ : অজানা অধ্যায়*, (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৫) পৃ. ৩২

[৩১] সাক্ষাৎকার, খন্দকার আবদুল বাতেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় বয়স ২৫, বর্তমান বয়স : ৭২; টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা; বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য, ১৩৫; টাঙ্গাইল-৬। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০১৮, স্থান : ৫/৪০৪, সংসদ সদস্য ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা। বর্তমান গবেষক কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে এই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত।